শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু

(জন্ম-১৯০২, মৃত্যু-১৯৫৭)

সঞ্জয় ব্রহ্ম

সুনির্মল বসু ছিলেন শিশু সাহিত্যিকদের অগ্রণী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম একজন। তার সৃষ্ট সমগ্র সাহিত্য বাংলা ভাষায় সৃষ্ট শিশু সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। তাই সময়ের বিচারে জন্ম শতবর্ষ পেরিয়েও তিনি এবং তার সাহিত্য শিশু কিশোর থেকে বয়স্ক সকলের মধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয়।

বাংলা শিশু সাহিত্যের চর্চ্চা শুরুর বয়স খুব বেশী নয়। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের শুরুর-দিকটা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — "রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের ওপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া — স্তরবদ্ধ — পলিমৃত্তিকা লেপন করিয়া গিয়াছেন।" প্রসঙ্গতঃ তিনি লিখেছেন — "তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধা সহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে গ্রাম্য— এবং ইংরেজি পণ্ডিতেরা বর্বর জ্ঞান করিতেন।"

কাজেই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির কিছুটা সময় পেরিয়ে এলেই লক্ষ করা যাবে যে শিশু সাহিত্যিক বলে তেমন কোন প্রকারভেদ ছিল না। শিশুদের মনোরঞ্জনকারী—যা কিছু ছড়া লোক-কথা ও কাহিনী ছিল, তা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সেইসব মৌখিক ছড়া ও গাঁথার মধ্য দিয়ে রূপকথার কল্পলোক থেকে রামায়ণ, মহাভারত, ভূত-পেত্নী, দৈত্যদানব সবই থাকতো। বাংলার শিশু সাহিত্যের আদি আকর বলতে গেলে, এই সব কিছুকেই সামগ্রিকভাবে বলতে হয়। এর মধ্য থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিছু ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন। যেমন—

"আয় আয় চাঁদ মামা টী দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা

মাছ কুঁটলে মুড়ো দেবো, ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো
কালো গরুর দুধ দেবো
দুধ খাবার বাটী দেবো
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।"

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা সাহিত্যের শৈশব-দশা দূর হবার পরবর্তী পর্যায়ে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর উপেন্দ্র কিশোর, সুকুমার রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রমুখের মৃত্যুর পর বাংলা শিশু সাহিত্যের গতি হঠাৎ যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্যের বৃহত্তর জগতে বহুবিধ সৃষ্টি কর্মে মগ্ন। অবনীন্দ্রনাথ এক সময় শিশুদের জন্য লিখেছেন, কিন্তু তিনি সেই সময় রঙ তুলি নিয়ে ব্যস্ত। বাংলা শিশু সাহিত্য তখন রক্তাল্পতায় ভুগছে। ঠিক তার পরেই বাংলা শিশু সাহিত্য পেল লেখক সুনির্মল বসুকে। বাংলা শিশু সাহিত্যের ধমনীতে যেন নতুন করে রক্ত সঞ্চালিত হল।

❑ সাহিত্যে অনুপ্রেরণা

শৈশবে সুনির্মল বসু পেয়েছেন তার সাহিত্যানুরাগী সুকবি দাদামশায় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মশাইকে। তিনি পাহাড়িয়া পাখি এই ছদ্মনামে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। তার রচিত হাসিখুশি, মোহনভোগ, হিতোপদেশ ইত্যাদি লেখাগুলি কিশোর সুনির্মলকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। মনে মনে তিনি কিশোর বয়স থেকেই লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবি সুনির্মল লিখেছেন, — 'এই সব গল্পগুলো আমার মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করত। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে রাতে মশারীর বাইরে মোমবাতি জ্বালিয়ে লেখার চেষ্টা করতাম।'

সুনির্মল বসুর বাবা পশুপতি বসু ঠাকুর মহাশয় সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন। তিনি কিশোর সুনির্মলকে বহুবিধ বই উপহার দিতেন। কাজেই সুনির্মলের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে এই রকম এক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে।

সুনির্মল বসু বিভিন্ন ছোট ছোট পত্রিকাতে লেখালেখি করতে করতে পরবর্তী কালে তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। ঐ পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি পাঠক সমাজে সুপরিচিত হন। ঐ পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'মুন্সিজী' নামে তার হাস্য রসাত্মক গল্প প্রকাশিত হয়। এইটিই সম্ভবতঃ তার প্রকাশিত প্রথম গল্প।

'সুনির্মল বসুর সাহিত্য কর্মে শিশু কিশোরদের মনোজগত, প্রকৃতি, পশুপাখি মানুষ প্রভৃতি চারপাশের সবই স্থান পেয়েছে। তার সুনিপুণ লেখনী আর কল্পনা শক্তি পাঠক পাঠিকার মননের গভীরে প্রবেশ করেছে। সেই বোধ থেকেই তিনি তার সাহিত্য কর্মের চরিত্র চিত্রণ করেছেন।

❑ ছড়া ও কবিতা

সুনির্মল বসুর ছড়ার ছন্দ ও বিষয় শিশু মনকে আকর্ষণ করার মত। তার 'ছড়ার ছবি' এক-দুই-তিন-চার প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। ছড়ার সাথে তিনি কবিতাও লিখেছেন অনেক। যেমন—রোগের চিকিৎসা, গরুর গাড়ি, সোঁদর বনে গানের আসর, শিঙ্গিমামা শিঙ্গি -মাছ, ভূতো দা, বঙ্গ বিহার সমস্যা ইত্যাদি এক একটি বিষয়কেন্দ্রিক। কোথাও কেবল ছন্দের

মজা, আবার কোথাও শিক্ষণীয় বিষয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগ। কোথাও আবার নাটকীয় পরিবেশ।

"সোঁদর বনে গানের আসর
বসল সেদিন জঙ্গলে
যোগ দিল তায় বনের যত
গায়ক পশুর দঙ্গলে—
শেয়াল এসে ধরল খেয়াল
হুক—কা হুয়া-ডাক ছাড়ি
নেউলগুলো ধরল বউল।
লেজ তুলি আর নাক নাড়ি।
বাঘের স্ত্রী সে বাগেশ্রীতে
জোর দেখাল ওস্তাদি
হাম্বারবে হাম্বির গায়
বনের গোরু, মোষ আদি।

সুনির্মল বসুর অন্য একটি ছড়া 'বঙ্গ বিহার সমস্যা।

"এসো এসো আলাপ করাই বঙ্গবাবুর সঙ্গে
বঙ্গবাবু নামটি বটে থাকেন নাকো বঙ্গে
বঙ্গবাবুর ভাইটি শ্রীমান বিহারী লাল পাত্র
বঙ্গদেশের ইস্কুলে একা পড়ান তিনি ছাত্র।"

কিংবা 'ভাগলপুরের ছাগল' নামের

ভাগলপুরের ছাগল হঠাৎ
পাগল হয়ে যায়।
শিঙ্ বাগিয়ে লাগায় তাড়া
সামনে যারে পায়।
কাঁকুড়গাছির ঠাকুর দাদা আনছে কিনা ডিমের গাদা,
এমন সময় ছাগল তেড়ে গুতিয়ে দিল তায়
ঠাকুর দাদা গড়িয়ে পড়ে,
ডিমগুলো সব ছড়িয়ে পড়ে,
ডিমের রসে ঠাকুর দাদার চেনাই হল দায়।

❑ **গল্প**

সুনির্মল বসুর 'ইন্টিবিন্টির-আসর, সিঙ্গী বাবা, ভোম্বল দাস, সেয়ানে সেয়ানে, অকেজো ঘোড়ার কীর্তি, হারুসর্দ্দারের বাঘ শিকার, গাট্টা তেওয়ারী ইত্যাদি এক একটি অনবদ্য সমৃদ্ধ গল্প।

'গাট্টা তেওয়ারী' এক ব্যক্তি যে একাধারে পাচকের কাজ করে আবার অন্যদিকে কুস্তিগীর পালোয়ান। সে রাজবাড়ীর রসুইঘর সামলানোর কাজ করে এবং অন্যদিকে রাজবাড়ীর কুস্তির

আখড়ায় একজন পালোয়ান। এই যুগ্ম দায়িত্বের চাকুরীতে লাগার পর থেকে সে খায়-দায় আর ঘুমায়। পালোয়ান কুস্তিগীর কাজেই তাকে কেউ ঘাটায় না। একদিন গ্রামে বুনো মোষের আক্রমণে ভীত হয়ে প্রজারা রাজামশাই এর দারস্থ হল। রাজামশাই গাট্টা তেওয়ারীকে দায়িত্ব দিলেন ঐ মোষকে কব্জা করার জন্য। খবরটা শুনে, গাট্টা তেওয়ারী গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বনে আশ্রয় নিল। কিন্তু সেই বনে গিয়ে মোষ গাট্টাকে তাড়া করল। গাট্টা গাছে উঠে পড়ল। কিন্তু বুনো মোষের গর্জনে সে গাছ থেকে পড়ল ঐ মোষের পিঠে। মোষের পিঠে পড়েই গাট্টা গামছা দিয়ে মোষের চোখ বেঁধে ফেলল, তারপর দুটো শিং ধরে তার পিঠে চড়ে রাজবাড়ির দিকে যাত্রা করল। মোষ গাট্টার বশীভূত হল। চারদিকে গাট্টা তেওয়ারীর জয় জয় করে রব উঠল।

এই কাহিনীর সম্বাব্যতার চেয়ে শিশু কিশোরদের মনে এক অদ্ভুত চরিত্র চিত্রণ এবং কাহিনীর নাটকীয়তা অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক। গাট্টা পালোয়ান হলেও সে খুব ভীতু। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে ভয় পেয়ে মোষের পিঠে পড়ার পর উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে তার মান রক্ষা করতে পেরেছিল। এই গল্পে এক ধরণের সিরিও কমিকের ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। গাট্টার কাছে মোষকে বশ করার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা সে মোষের ভয়েই গাছে উঠে পড়েছে। তার কাছে রাজাদেশ খুবই সিরিয়াস বিষয়। তার চাকরী নির্ভর করছে এই পরীক্ষার উপর। কিন্তু ঘটনাক্রে অত্যন্ত হাস্যকরবাবে গাট্টা মোষের পিঠে পড়ে তৎক্ষণাৎ মোষকে বশ করে ফেলল। এটা কাহিনীর নাটকীয়তা। সুনির্মল বসু শিশুদের চিত্তাকর্ষক করার জন্য তাদের জীবন বোধের উপযোগী নাটক বুঝতেন। তাই তিনি গাট্টা তেওয়ারীর মতো চরিত্র আঁকতে পেরেছিলেন।

সুনির্মল বসুর আর একটি গল্প 'চোর ধরা'। এই গল্পটি লেখক অশীতিপর বৃদ্ধা দিদিমার মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন। দিদিমা তার জানা একটি ঘটনা নাতী-নাতনীদের বলছেন। কাহিনীটি ঃ একবার দিদিমার কর্তামশাই তাদের নারকেল বাগানে চোর ধরতে তার পুত্র ও মালীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কর্তার জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভু সম্পর্কে এক কঁচিকাচা দলের মামা। সেই শম্ভু আর মালী লক্ষ্য করে যে চোর গাছ থেকে সামনের পুকুরে ধুপধাপ নারকেল ফেলছে। গাছটি ছিল উঁচু। তাই শম্ভু এবং মালী একটি বাঁশের সাথে আর একটি বাঁশ বেঁধে সেই বাঁশ দিয়ে খোঁচা মেরে চোরকে গাছ থেকে নামিয়ে আনবে। চোর গাছ থেকে পুকুরে ধুপ-ধাপ নারকেল ফেলতে ফেলতে কোন এক সুযোগে নিজেই জলে লাফিয়ে পড়ে, সাঁতার দিয়ে অন্য পারে উঠে পালিয়ে যায়। কঁচিকাচার দল দিদিমার মুখে চোরের কাছে বড় মামা শম্ভুর অপদস্ত হওয়ার কাহিনী শুনে হাসিতে ফেটে পড়ে। গল্প পরিবেশন উপস্থাপনা ইত্যাদি সবদিক থেকে সুনির্মল বসু তার নিজস্বতা বজায় রেখেছেন। গল্পের মধ্যে গল্প সুনির্মল বসুর আর একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর অন্যতম আর একটি গল্প 'হজমিগুলি' গল্পটিতেও এই রকম একটি পাহাড়ী সাধুর প্রসঙ্গ এনেছেন। ঐ পাহাড়ী সাধু নাকি বিশুর দাদামশাইকে একরকম গুড়ো শুকতে দেওয়ার পরই তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই কাহিনী গ্রামের বৃদ্ধ কবিরাজ মশাইও স্বীকার করেন। লেখক এই গল্পে এক অলৌকিক শক্তির কথা বলতে গিয়ে আর একটি গল্পের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। সে গল্প এক ডাক্তারের। ডাক্তার নরহরি দত্তের কাছে একবার

এক পাহাড়ী ছেলেকে নিয়ে এল। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানলেন—ছেলেটির ক্যান্সার হয়েছে। ডাক্তার ছেলেটির চিকিৎসার জন্য অস্ত্রোপচার করার জন্যই ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। কিছুদিন পর ডাক্তার রুগী দেখতে শহরের বাইরে গেছেন। এমন সময় এক সাধু এলো হজমিগুলি বিক্রি করতে। ডাক্তার গিন্নি হজমিগুলি কিনলেন।

রাতে হরিণের মাংস খাওয়ার পর ছেলে মেয়েদের হজমিগুলি খেতে দিলেন। সেই হজমিগলির প্রভাবে ডাক্তারের চার ছেলে মেয়ে অদৃশ্য হলো। তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই গল্পটিতে অলৌকিক ঘটনাই শেষ পর্য্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রশ্ন যতই থাক না কেন গল্পের পরিণতি করুন। সন্তান হারা পাহাড়ী লোকটা বুঝি ডাক্তারের সাথে এইভাবেই বদলা নিল। সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই সাধুর ছদ্মবেশে এসেছিল। গল্পের শুরুতে কিন্তু মনে হয়েছিল পাহাড়ী লোকটি ছেলের মৃত্যুতে শোকার্ত হয়ে এর বদলা নেওয়ার জন্য হিংস্র হয়ে উঠবে। খুন জখম করতে পারে। কিন্তু লেখক পরিণতিতে কোন রকম হিংস্রতার আশ্রয় নেন নি। হয়তো কেউ কেউ গল্পটি গাজাখুরি বলে উড়িয়ে দিলেও, গল্পটি শিশু কিশোরদের চিত্তাকর্ষক অতি অবশ্যই।

আবার 'হারু সর্দ্দারের বাঘ শিকার' সম্পূর্ণ অন্য ধরণের গল্প। গল্পের শুরুতে হারু সর্দ্দারের চেহারার বর্ণনা দিয়ে তিনি গল্প শুরু করেছেন। সে মামাবাড়ি থেকে ভোজ খেয়ে বাড়ি ফিরছে। দীর্ঘপথ। রাত হতে পারে। তাই সাথে সম্বল মোমবাতি আর দেশলাই। হারু সাহসী! সে গান গাইতে গাইতে পথে এগিয়ে চললো। পথ চলতে চলতে সে দম নেবার জন্য একটি বিড়ি ধরালো। এমন সময় সে জঙ্গলের মধ্যে শুকনো পাতার খস্ খস্ শব্দ এবং বাঘের গায়ের বোটকা গন্ধ নাকে পেল। মুহূর্তকাল পরেই বাঘের গগনভেদী গর্জন শুনে হারু গাছে উঠে পড়ল। বাঘ গাছের নীচে ওৎ পেতে বসে রইল। রাত বাড়ল। হারুর মাথায় বুদ্ধি এল। সে তার সাথে আনা কাঁচা মাংস ছুরি দিয়ে কেটে গাছের নীচে ফেলতে শুরু করল। বাঘটা সেই মাংসের টুকরো খেতে লাগল। এদিকে মাংস ফুরিয়ে এসেছে। হঠাৎ হারুর মাথায় বুদ্ধি খেললো। সে তার ছুরিটা মোমবাতির আগুনে তাপ দিয়ে লাল করে সেটাকে গাছের নীচে ছুড়ে ফেললো। আর যায় কোথায় মাংসের টুকরো ভেবে বাঘ তপ্ত ছুরি গিলে যন্ত্রনায় চিৎকার করতে করতে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল। ভোরবেলায় হারু গাছ থেকে নেমে বাড়ি ফেরার পথে দেখল বাঘটি জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় মরে পড়ে আছে। উপস্থিত বুদ্ধির চমৎকারিত্ব শিশুদের চিত্তাকর্ষক করার উপাদান সুনির্মল বসুর প্রায় সব গল্পের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। শিশু মনের উপযোগী করে গল্পের প্লট তৈরী করা এবং প্রতিটি লাইনে কৌতুহল। অর্থাৎ পাঠক যখন পড়ছে, সে তখন হারু গাছে উঠে মাংস টুকরো টুকরো করে নীচে ফেলার সময় ভাবছে—এরপর হারু কি করবে। কতটুকু মাংসই বা তার কাছে অবশিষ্ট আছে। এই টেনশনের মুহূর্তে সে তার ছুরিটা মোমবাতিতে গরম করে লাল হয়ে উত্তপ্ত অবস্থায় নীচে ছুড়ে ফেলবে এবং বাঘ সেটিকে মাংস ভেবে গিলে ফেলবে। এটা সত্যই সম্ভব কিনা? কিংবা গল্পের শুরুতে মোমবাতি ও ছুরি নিয়ে হারু যাত্রা শুরু করেছে দূরপথের উদ্দেশ্যে, একথা বলা হলেও হারু যে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাংস নিয়ে ঐ পথে ফিরছিল এবং তা টুকরো টুকরো করে ফেলে অনেকক্ষণ ধরে বাঘের ক্ষিদে মেটানো যায়। সে মাংস এতই সুস্বাদু যে বাঘ মোহগ্রস্থ হয়ে

মাংস ভেবে তপ্ত লোহা গিলে ফেলে। এসব যুক্তিহীনতার প্রশ্ন উঠতে পারে। — কিন্তু পরিবেশনার গুণে এবং বাক্যবন্ধতার মধ্য দিয়ে টেনশন তৈরিতে লেখক সুনির্মল সিদ্ধহস্ত। সেই কারণেই শিশু কিশোর পাঠক তার লেখা পড়ে মজা পায়। লাইনের পরে লাইনে এগিয়ে চলে পাঠক পাঠিকার কৌতুহল। তার কিছু কিছু গল্প আছে, তিনি ঠাকুমা দিদিমার মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন। ঠাকুমা দিদিমাকে ঘিরে নাতি-নাতিনীরা গল্প শুনছে। সে গল্প শিশুদের নিছক আনন্দ দেওয়ার জন্য কথা মালা তৈরী করা। — সেখানে সাধুর দেওয়া সাদাগুঁড়া শুঁকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ডাক্তারবাবুর ছেলে-মেয়েরা হজমিগুলি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যেন ঘটনার প্রবাহ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেখানে যুক্তি তর্ক বিজ্ঞান এসবগুলো নিয়ে ততটা মাথা ঘামান নি। শিশুদের আনন্দ দান করার জন্যই লিখেছেন।

❑ নাটক ও ছড়া নাটিকা

সুনির্মল বসুর নাটকগুলি নির্মল হাসির খোরাকে প্লাবিত। শিশুচিত্তের প্রতি বিশেষ নজর রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন। যেমন ছড়ার ছন্দে লিখিত মামা ভাগনে রচনাটি। — বাঘের চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে এসেছে। একদিন সে ঠিক করলো যে শিয়ালের সাথে শহরে যাবে চশমা নিতে। পথে নদী পেরুতে হবে। শিয়াল বাঘকে নৌকায় আগে তুলল। আসলে সেটি নৌকা না, একটা কুমিরের পিঠে বাঘ কুমিরের পিঠে উঠতেই লাগল তুমুল লড়াই। শিয়াল পালিয়ে গেল যাবার আগে ছড়া কেটে বলল—.

"রে রে মামা গাদা
আমার হাসি ফুটল যখন
তোমার শুরু কাঁদা
মস্ত তুমি গাধার মতন
ভেতরে ঠিক গাধা।"

সুনির্মল বসু শিশু মনের আগ্রহের প্রতি নজর রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন। যেমন বুদ্ধ ভূতুম আরশোলা ফড়িং টিকটিকি, আনন্দ নাড়ু, ত্রিরত্ন, উদোভুদো আর মামা, ব্যস্তবাগীশ, মুস্কিল আসান ইত্যাদি। তার অধিকাংশ নাটকই ছড়ার ছন্দে। আর আমাদের চারপাশের সব কিছুই। যেমন—আরশোলা, ফড়িং টিকটিকি।

আরশোলা — ওরে ফড়িং তিড়িং বিড়িং লাফাস কেন আজ।
হদ্দ কুঁড়ে বদ্ধ পাগল নাই কি কোনো কাজ।
দেখনা আমি সারাটি দিন খাটি কেমন করে।
লক্ষীছাড়া নাচন ছাড়া, কাজ কি নাই তোর?

ফড়িং— আরে আরে আরাশোলা তুই বক্‌বকানি রাখ;
ঘুটে গাদায় ঘুরে বেড়াস, বড্ড দেখি জাঁক।
নোংরা যত আবর্জনা, তুই খুঁটে খাস,
পরের ত্রুটি ধরার আগে নিজের দিকে চাস্।

আবার উদো-ভুদো মামা নাটকটি হাস্যরসাত্মক। সাত বছরের উদো ও বারো বছরের ভুদো বসে পড়া করছে। উদো চিৎকার করে পড়ছে। আর ভুদো গুন গুন করে পড়ছে।

উদো— সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

মামা— ও কি হচ্ছে উদো?

উদো— আজ্ঞে পড়া মুখস্থ করছি।

মামা— ছাই করছিস। হাতির ডিম করছিস। কবিতার পিণ্ডি চটকাচ্ছিস। এদিকে বলছিস্—সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, এটাকি সকাল নাকি?

উদো— না সন্ধ্যা।

মামা— তবে চালাকি হচ্ছে? বল, সন্ধ্যায় বসিয়া আমি
—আবার প্যাঁচা বাদুর, বোয়াল, নাটকটি—

প্যাঁচা-(কোটরে বসে) ঝরলো বাদল ঝম্‌ঝমাঝম্ সারাটি রাত ধরেও বার হাওয়া তাই হয়নি আমার, আছি উপোস করে।
এতক্ষণে ভোর হয়েছে, ঝরছে দিনের আলো / কি করি হায়, দিনের বেলায় দেখতে না পাই ভালো/ ইঁদুর বাদুড় ব্যাঙ ব্যাঙাচি ফড়িং টরিং হলে/ মিটত কিছু খিদের জ্বালা-পেটটি যায় জ্বলে।

(পাশের ডালেই একটি বাদুড় ঝুলছিলো। বাদুড় খাওয়ার কথা শুনে)

বাদুড় (স্বগত) ইঁদুর বাদুড় খেতে তোমার সাধ হয়েছে নাকি?
মজা তোমায় দেখাচ্ছি আজ দাঁড়াও ভুতুম পাখি।

(জোরে) আচ্ছা আচ্ছা দুঃখ বড় তোমার কথা শুনে
ভুতুমদাদা আমরা সবাই মুগ্ধ তোমার গুণে।

প্যাঁচা— কে হে তুমি রসিক ভায়া, ডাকছ আমায় দাদা
সত্যি কথা, বুঝছি এবার মনটি তোমার সাদা।

বাদুড়— রংটি কালো মনটি সাদা, মরছি তোমার শোকে
দিনের বেলায় তোমার মত দেখতে না পাই চোখে।

প্যাঁচা— নাম কি তোমার? বাদুড় বুঝি তোমায় জানি
পশুও নয়, পাখিও নয়, আজব তুমি প্রাণী।
তোমার খবর আমার কাছে ভালো করেই জানা,
যেমনি তোমার রূপ, তেমনি গুণ রয়েছে নানা।

বাদুড়— তা কিছু ভাই গুণ আছে মোর। সমস্ত দিন ধরি
গাছের ডালে কায়দা করে শীর্ষ আসন করি
ঠ্যাং চলে যায় উপর দিকে উল্টে থাক মাথা
সমস্ত দিন ধ্যান করি তার পরম যিনি দাতা
এই ধ্যানেতে বিদ্যা অনেক লাভ করেছি আমি
ইচ্ছা মতন খাবার আমার জুটছে দিবাযামী।

সুনির্মল বসুর এই পর্যায়ের ছড়া নাটিকাগুলি জীব জগতের আহার বিহার ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। ছড়া নাটিকার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি পাঠের এই প্রচেষ্টা বাংলা শিশু-পাঠ্যে নিঃসন্দেহে তার সময়ে অভিনব।

সুনির্মল বসু নাটক লিখেছেন। তার নাটক সংকলনের ভূমিকা পর্বে তিনি নিজেই লিখেছেন, "শিশুরা—মধ্যে মধ্যে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে নাচ গান আবৃত্তি করে। এই আনন্দোৎসব আরো জমে ওঠে, যদি তাতে ছোট ছোট মজাদার নাটিকার যোগান দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যেই আমি টুকরো টুকরো হাসির নক্সা লিখেছিলাম। এই সব ছোট নাটিকা অভিনয় করতে কোন হাঙ্গামা নাই ও সাজ পোষাকের কোন বালাই নাই? সাধারণ জামা কাপড় পরেই নামা চলবে। মুখোস নাটকে চরিত্রানুযায়ী কয়েকটি মুখোস তৈরী করে ব্যবহার করতে হবে। রূপ রাজ্যের রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে রঙীন আলো টালো দিয়ে।"

সুনির্মল বসুর প্রকাশিত কবিতার বই আঠারোটি, গল্প প্রায় আঠাশটি, ছন্দ শিক্ষা বিষয়ে চারটি, নাটক সাতটি। এছাড়াও তার রচিত কিশোর উপন্যাস, রূপকথার গল্প ইত্যদি রয়েছে। আর রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার বই ছড়া ও ছবিতে অ আ ক খ এবং জীবন খাতার কয়েক পাতা নামে স্মৃতি কথা।

সুনির্মল বসুর আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সূর্য সেন প্রমুখদের জীবন গাঁথা সমৃদ্ধ ছড়া। শিশু পাঠ্য হিসাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন মাষ্টারদাকে নিয়ে ছড়াটি—

"সূর্যের মত প্রখর দীপ্ত সূর্য সম
ঘন দুর্যোগে সূর্যের মত জ্বলে ওঠেন।
মুক্ত করিতে চট্টগ্রাম
করেন চেষ্টা অবিশ্রাম।"

সুনির্মল বসুর সাহিত্যকর্ম সর্বসাকুল্যে নেহাৎ কম নয়। আত্মকথা ছাড়া তার সব লেখাই শিশু কিশোরদের জন্য। তার ছড়া পাঠ্যপুস্তকের অর্ন্তভুক্ত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় শ্রদ্ধেয় অতি জনপ্রিয় অগ্রজ সাহিত্যিক বুদ্ধেদেব গুহ মহাশয়ের তিনি ছিলেন আপন বড় মামা। বুদ্ধদেব গুহ মশাই তার বড় মামা সম্পর্কে লিখেছেন—"সুনির্মল বসু ছিলেন সেই প্রজন্মের কবি, যে প্রজন্মে কাব্য সাহিত্য জগতের মানুষরা অর্থ বা যশের কাঙালী ছিলেন না। সাহিত্যসেবা ছিল তার কাছে যথার্থ পূজো। সেই নির্মল মমতা ও একনিষ্ঠতা আজকাল প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। সাহিত্য জগত থেকে তাঁরা যশ পেতেন যোগ্যতার নিরিখেই; কিন্তু অর্থ পেতেন অতি সামান্য।

পরিশেষে তার জন্ম শতবর্ষে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী। তাকে নিয়ে আলোচনা হোক। তার সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম ছোটদের কাছে আরো বেশি করে যাক্। তারা তার লেখা পড়ুক জানুক। — আর সেই কারণেই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের মধ্য দিয়ে তার কিছু সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা।